ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ

2011-04-12 11:04:43 QuranerAlo Editor

লেখকঃ মোঃ এনামুল হক

ভূমিকা

নববর্ষ বা New Year's day – এই শব্দগুলো নতুন বছরের আগমন এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত উ□সব-অনুষ্ঠানাদিকে ইঙ্গিত করে। এতদুপলক্ষে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, হাসিঠাট্টা ও আনন্দ উপভোগ, সাজগোজ করে নারীদের অবাধ বিচরণ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী, রাতে অভিজাত এলাকার ক্লাব ইত্যাদিতে মদ্যপান তথা নাচানাচি, পটকা ফুটানো – এই সবকিছু কতটা ইসলাম সম্মত? ৮৭ ভাগ মুসলিম যে আল্লাহতে বিশ্বাসী, সেই আল্লাহ কি মুসলিমদের এইসকল আচরণে আনন্দ-আপ্লুত হন, না ক্রোধান্বিত হন ? নববর্ষকে সামনে রেখে এই নিবন্ধে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ।

ইসলাম ধর্মে উ□সবের রূপরেখা

অনেকে উপলব্ধি না করলেও, উ□সব সাধারণত একটি জাতির ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। উ□সবের উপলক্ষগুলো খোঁজ করলে পাওয়া যাবে উ□সব পালনকারী জাতির ধমনীতে প্রবাহিত ধর্মীয় অনুভূতি, সংস্কার ও ধ্যান-ধারণার ছোঁয়া। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন তাদের বিশ্বাসমতে স্রষ্টার পুত্রের জন্মদিন।

মধ্যযুগে ইউরোপীয় দেশগুলোতে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ পালিত হত ২৫শে মার্চ, এবং তা পালনের উপলক্ষ ছিল এই যে, ঐ দিন খ্রীস্টীয় মতবাদ অনুযায়ী মাতা মেরীর নিকট ঐশী বাণী প্রেরিত হয় এই মর্মে যে, মেরী ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম দিতে যাচ্ছেন। পরবর্তীতে ১৫৮২ সালে গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডারের সূচনার পর রোমক ক্যাথলিক দেশগুলো পয়লা জানুয়ারী নববর্ষ উদযাপন করা আরম্ভ করে। ঐতিহ্যগতভাবে এই দিনটি একটি ধর্মীয় উ□সব হিসেবেই পালিত হত। ইহুদীদের নববর্ষ 'রোশ হাশানাহ' ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ইহুদীদের ধর্মীয় পবিত্র দিন সাবাত হিসেবে পালিত হয়। এমনিভাবে প্রায় সকল জাতির উ□সব-উপলক্ষের মাঝেই ধর্মীয় চিন্তা-ধারা খুঁজে পাওয়া যাবে। আর এজন্যই ইসলাম ধর্মে নবী মুহাম্মাদ (সা.) পরিষ্কারভাবে মুসলিমদের উ□সবকে নির্ধারণ করেছেন, ফলে অন্যদের উ□সব মুসলিমদের সংস্কৃতিতে প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঈদ রয়েছে, আর এটা আমাদের ঈদ ।" [বুখারী, মুসলিম]

বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ সম্পর্কে বলেন:

"উ□সব-অনুষ্ঠান ধর্মীয় বিধান, সুস্পষ্ট পথনির্দেশ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেরই একটি অংশ, যা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

‘তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি একটি নির্দিষ্ট বিধান এবং সুস্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি।’ [আল-মায়িদাহ :৪৮]

‘প্রতিটি জাতির জন্য আমি ধর্মীয় উপলক্ষ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যা তাদেরকে পালন করতে হয়।’ [আল-হাজ্জ্ব :৬৭]

যেমনটি কিবলাহ, সালাত এবং সাওম ইত্যাদি। সেজন্য তাদের [অমুসলিমদের] উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া আর তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই উৎসব-অনুষ্ঠানের সাথে একমত পোষণ করা অর্থ কুফরের সাথে একমত পোষণ করা। আর এসবের একাংশের সাথে একমত পোষণ করা অর্থ কুফরের শাখাবিশেষের সাথে একমত হওয়া। উৎসব-অনুষ্ঠানাদি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যার দ্বারা ধর্মগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়।...নিঃসন্দেহে তাদের সাথে এসব অনুষ্ঠান পালনে যোগ দেয়া একজনকে কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আর বাহ্যিকভাবে এগুলোতে অংশ নেয়া নিঃসন্দেহে পাপ। উৎসব অনুষ্ঠান যে প্রতিটি জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, এর প্রতি রাসূলুল্লাহ(সা.) ইঙ্গিত করেছেন, যখন তিনি বলেন: **‘প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঈদ রয়েছে, আর এটা আমাদের ঈদ।’ [বুখারী, মুসলিম]**

এছাড়া আনাস ইবনে মালিক(রা.) বর্ণিত:

> *“রাসূলুল্লাহ(সা.) যখন [মদীনায়] আসলেন, তখন তাদের দুটো উৎসবের দিন ছিল। তিনি(সা.) বললেন, ‘এ দুটো দিনের তাৎপর্য কি?’ তারা বলল, ‘জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এ দুটো দিনে উৎসব করতাম।’ রাসূলুল্লাহ(সা.) বললেন, ‘আল্লাহ তোমাদেরকে এদের পরিবর্তে উত্তম কিছু দিয়েছেন: ইয়াওমুদ্দুহা ও ইয়াওমুল ফিতর।’” [সুনান আবু দাউদ]*

এ হাদীস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম আগমনের পর ইসলাম বহির্ভূত সকল উৎসবকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে এবং নতুনভাবে উৎসবের জন্য দুটো দিনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে অমুসলিমদের অনুসরণে যাবতীয় উৎসব পালনের পথকে বন্ধ করা হয়েছে।

ইসলামের এই যে উৎসব – ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা – এগুলো থেকে মুসলিম ও অমুসলিমদের উৎসবের মূলনীতিগত একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য স্পষ্ট হয়, এবং এই বিষয়টি আমাদের খুব গুরুত্বসহকারে লক্ষ্য করা উচিৎ, যা হচ্ছে:

অমুসলিম, কাফির কিংবা মুশরিকদের উৎসবের দিনগুলো হচ্ছে তাদের জন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দিন, এদিনে তারা নৈতিকতার সকল বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে অশ্লীল কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, আর এই কর্মকান্ডের অবধারিত রূপ হচ্ছে মদ্যপান ও ব্যভিচার। এমনকি খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের বহুলোক তাদের পবিত্র বড়দিনেও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে মদ্যপ হয়ে ওঠে, এবং পশ্চিমা বিশ্বে এই রাত্রিতে কিছু লোক নিহত হয় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ী চালানোর কারণে।

অপরদিকে মুসলিমদের উৎসব হচ্ছে ইবাদতের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এই বিষয়টি বুঝতে হলে ইসলামের সার্বিকতাকে বুঝতে হবে। ইসলাম কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, বরং তা মানুষের গোটা জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী বিন্যস্ত ও সজ্জিত করতে উদ্যোগী হয়। তাই একজন মুসলিমের জন্য জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইবাদত, যেমনটি কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন:

> **“আমি জ্বিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোন কারণে সৃষ্টি করিনি।” [সূরা যারিয়াত:৫৬]**

সেজন্য মুসলিম জীবনের আনন্দ-উৎসব আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ ও অশ্লীলতায় নিহিত নয়, বরং তা নিহিত হচ্ছে আল্লাহর দেয়া আদেশ পালন করতে পারার মাঝে, কেননা মুসলিমের ভোগবিলাসের স্থান ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী নয়, বরং চিরস্থায়ী জান্নাত। তাই মুসলিম জীবনের প্রতিটি কাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে থাকবে তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, তাদের ঈমান, আখিরাতের প্রতি তাদের অবিচল বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা।

তাইতো দেখা যায় যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা – এ দুটো উৎসবই নির্ধারণ করা হয়েছে ইসলামের দুটি স্তম্ভ পালন সম্পন্ন করার প্রাক্কালে। ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ সাওম পালনের পর পরই মুসলিমরা পালন করে ঈদুল ফিতর, কেননা এই দিনটি আল্লাহর আদেশ পালনের পর আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার ও ক্ষমার ঘোষণা পাওয়ার দিন বিধায় এটি সাওম পালনকারীর জন্য বাস্তবিকই উৎসবের দিন – এদিন এজন্য উৎসবের নয় যে এদিনে আল্লাহর দেয়া আদেশ নিষেধ কিছুটা শিথিল হতে পারে, যেমনটি বহু মুসলিমদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা এই দিনে আল্লাহর আদেশ নিষেধ ভুলে গিয়ে অশ্লীল কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, বরং মুসলিমের জীবনে এমন একটি মুহূর্তও নেই, যে মুহূর্তে তার ওপর আল্লাহর আদেশ নিষেধ শিথিলযোগ্য। তেমনিভাবে ঈদুল আযহা পালিত হয় ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হাজ্জ পালনের প্রাক্কালে। কেননা ৯ই জিলহজ্জ হচ্ছে ইয়াওমুল আরাফা, এদিনটি আরাফাতের ময়দানে হাজীদের ক্ষমা লাভের দিন, আর তাই ১০ই জিলহজ্জ হচ্ছে আনন্দের দিন – ঈদুল আযহা। এমনিভাবে মুসলিমদের উৎসবের এ দুটো দিন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করার দিন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন এবং শরীয়তসম্মত বৈধ আনন্দ উপভোগের দিন – এই উৎসব মুসলিমদের ঈমানের চেতনার সাথে একই সূত্রে গাঁথা।

নতুন বছরের সাথে মানুষের কল্যাণের সম্পর্ক

নতুন বছর নতুন কল্যাণ বয়ে আনে, দূরীভূত হয় পুরোনো কষ্ট ও ব্যর্থতার গ্লানি – এধরনের কোন তত্ত্ব ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়, বরং নতুন বছরের সাথে কল্যাণের শুভাগমনের ধারণা আদিযুগের প্রকৃতি-পুজারী মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণার অবশিষ্টাংশ। ইসলামে

এ ধরনের কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। বরং মুসলিমের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই পরম মূল্যবান হীরকখন্ড, হয় সে এই মুহূর্তকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে, নতুবা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বছরের প্রথম দিনের কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। আর তাই তো ইসলামে হিজরী নববর্ষ পালনের কোন প্রকার নির্দেশ দেয়া হয়নি। না কুরআনে এর কোন নির্দেশ এসেছে, না হাদীসে এর প্রতি কোন উৎসাহ দেয়া হয়েছে, না সাহাবীগণ এরূপ কোন উপলক্ষ পালন করেছেন। এমনকি পয়লা মুহাররামকে নববর্ষের সূচনা হিসেবে গণনা করা শুরুই হয় নবীজীর(সা.) মৃত্যুর বহু পরে, উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা.) আমলে। এ থেকে বোঝা যায় যে, নববর্ষ ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা তাৎপর্যহীন, এর সাথে জীবনে কল্যাণ-অকল্যাণের গতিপ্রবাহের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই, আর সেক্ষেত্রে ইংরেজি বা অন্য কোন নববর্ষের কিই বা তাৎপর্য থাকতে পারে ইসলামে?

কেউ যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, নববর্ষের প্রারম্ভের সাথে কল্যাণের কোন সম্পর্ক রয়েছে, তবে সে শিরকে লিপ্ত হল, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করল। যদি সে মনে করে যে আল্লাহ এই উপলক্ষের দ্বারা মানবজীবনে কল্যাণ বর্ষণ করেন, তবে সে ছোট শিরকে লিপ্ত হল। আর কেউ যদি মনে করে যে নববর্ষের আগমনের এই ক্ষণটি নিজে থেকেই কোন কল্যাণের অধিকারী, তবে সে বড় শিরকে লিপ্ত হল, যা তাকে ইসলামের গন্ডীর বাইরে নিয়ে গেল। আর এই শিরক এমন অপরাধ যে, শিরকের ওপর কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে চিরতরে হারাম করে দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন:

"নিশ্চয়ই যে কেউই আল্লাহর অংশীদার স্থির করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন, আর তার বাসস্থান হবে অগ্নি। এবং যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" [সূরা মায়িদাহ :৭২]

নববর্ষ উদযাপনের সাথে মঙ্গলময়তার এই ধারণার সম্পর্ক রয়েছে বলে কোন কোন সূত্রে দাবী করা হয় , যা কিনা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়। মুসলিমদেরকে এ ধরনের কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে ইসলামের যে মূলতত্ত্ব: সেই তাওহীদ বা একত্ববাদের ওপর পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

নববর্ষের অনুষ্ঠানাদি: শয়তানের পুরোনো কূটচালের নবায়ন

আমাদের সমাজে নববর্ষ যারা পালন করে, তারা কি ধরনের অনুষ্ঠান সেখানে পালন করে, আর সেগুলো সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য কি? নববর্ষের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে রয়েছে: পটকা ফুটিয়ে বা আতশবাজি পুড়িয়ে রাত ১২টায় হৈ হুল্লোড় করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের শান্তি বিনষ্ট করে নববর্ষকে স্বাগত জানানো, ব্যান্ড সঙ্গীত বা অন্যান্য গান-বাজনার ব্যবস্থা, সম্ভ্রান্ত পল্লীর বাড়ীতে বা ক্লাবে গান-বাজনা, মদ্যপান ও পান শেষে ব্যভিচারের আয়োজন ইত্যাদি – এছাড়া রেডিও টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান ও পত্রপত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র ও "রাশিফল" প্রকাশ।

এবারে এ সকল অনুষ্ঠানাদিতে অনুষ্ঠিত মূল কর্মকান্ড এবং ইসলামে এগুলোর অবস্থান সম্পর্কে পর্যালোচনা করা যাক:

নতুন দিন তথা সূর্যকে স্বাগত জানানো:

এ ধরনের কর্মকান্ড মূলত সূর্য-পূজারী ও প্রকৃতি-পূজারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুকরণ মাত্র, যা আধুনিক মানুষের দৃষ্টিতে পুনরায় শোভনীয় হয়ে উঠেছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজের অনেকেরই ধর্মের নাম শোনামাত্র গাত্রদাহ সৃষ্টি হলেও প্রকৃতি-পূজারী আদিম ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নকল করতে তাদের অন্তরে অসাধারণ পুলক অনুভূত হয়। সূর্য ও প্রকৃতির পূজা বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন জাতির লোকেরা করে এসেছে। যেমন খ্রীস্টপূর্ব ১৪ শতকে মিশরীয় "অ্যাটোনিসম" মতবাদে সূর্যের উপাসনা চলত। এমনি ভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় এবং মেসো-আমেরিকান সংস্কৃতিতে সূর্য পূজারীদেরকে পাওয়া যাবে। খ্রীস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত যীশু খ্রীস্টের তথাকথিত জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বরও মূলত এসেছে রোমক সৌর-পূজারীদের পৌত্তলিক ধর্ম থেকে, যীশু খ্রীস্টের প্রকৃত জন্মতারিখ থেকে নয়। ১৯ শতাব্দীর উত্তর-আমেরিকায় কিছু সম্প্রদায় গ্রীষ্মের প্রাক্কালে পালন করত সৌর-নৃত্য এবং এই উৎসব উপলে পৌত্তলিক প্রকৃতি পূজারীরা তাদের ধর্মীয়-বিশ্বাসের পুনর্ঘোষণা দিত। মানুষের ভক্তি ও ভালবাসাকে প্রকৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির সাথে আবদ্ধ করে তাদেরকে শিরক বা অংশীদারিত্বে লিপ্ত করানো শয়তানের সুপ্রাচীন "ক্লাসিকাল ট্রিক" বলা চলে। শয়তানের এই কূটচালের বর্ণনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে তুলে ধরেছেন:

"আমি তাকে ও তার জাতিকে দেখেছি, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করছে এবং শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য শোভনীয় করেছে..."[সূরা আন নামল :২৪]

নারীকে জড়িয়ে বিভিন্ন অশ্লীলতা:

নববর্ষের পার্টি বা "উদযাপন আয়োজনের" অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে নারীর সহজ-লভ্যতা – নিউ-ইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে অথবা ঢাকার গুলশান ক্লাবে – পশ্চিমেও এবং তাদের অনুকরণে এখানেও ব্যাপারটা একটা অলিখিত প্রলোভন। নববর্ষের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সমাজ-বিধ্বংসী যে বিষয়গুলো পাওয়া যাবে, তার মাঝে অন্যতম হচ্ছে নারীকে জড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতা। নববর্ষের পার্টি বা উদযাপন আয়োজনের সবত্রই সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী নারীকে পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশায় লিপ্ত দেখা যাবে। পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে যে সকল আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নারী। রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন:

"আমি পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বড় কোন ফিতনা রেখে যাচ্ছি না।" [বুখারী ও মুসলিম]

সমাজ নারীকে কোন অবস্থায়, কি ভূমিকায়, কি ধরনের পোশাকে দেখতে চায় – এ বিষয়টি সেই সমাজের ধ্বংস কিংবা উন্নতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। নারীর বিচরণক্ষেত্র, ভূমিকা এবং পোশাক এবং পুরুষের সাপেক্ষে তার অবস্থান – এ সবকিছুই ইসলামে সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ দ্বারা নির্ধারিত, এখানে ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রথা, হালের ফ্যাশন কিংবা ব্যক্তিগত শালীনতাবোধের কোন গুরুত্বই নেই। যেমন ইসলামে নারীদের পোশাকের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেয়া আছে, আর তা হচ্ছে এই যে একজন নারীর চেহারা ও হস্তদ্বয় ছাড়া দেহের অন্য কোন অঙ্গই বহিরাগত পুরুষেরা দেখতে পারবে না।

বহিরাগত পুরুষ কারা? স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীদের পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, মুসলিম নারী, নিজেদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনাহীন কোন পুরুষ এবং এমন শিশু যাদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে সংবেদনশীলতা তৈরী হয়নি, তারা বাদে সবাই একজন নারীর জন্য বহিরাগত। এখানে ব্যক্তিগত শালীনতাবোধের প্রশ্ন নেই। যেমন কোন নারী যদি বহিরাগত পুরুষের সামনে চুল উন্মুক্ত রেখে দাবী করে যে তার এই বেশ যথেষ্ট শালীন, তবে তা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শালীনতা-অশালীনতার সামাজিক মাপকাঠি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়, আর তাই সমাজ ধীরে ধীরে নারীর বিভিন্ন অঙ্গ উন্মুক্তকরণকে অনুমোদন দিয়ে ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারে যে, যেখানে বস্তুত দেহের প্রতিটি অঙ্গ নগ্ন থাকলেও সমাজে সেটা গ্রহণযোগ্য হয় – যেমনটা পশ্চিমা বিশ্বের ফ্যাশন শিল্পে দেখা যায়। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা ভারতবর্ষে যা শালীন, বাংলাদেশে হয়ত এখনও সেটা অশালীন – তাহলে শালীনতার মাপকাঠি কি? সেজন্য ইসলামে এধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে মানুষের কামনা-বাসনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং তা কুরআন ও হাদীসের বিধান দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। তেমনি নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অবাধ কথাবার্তা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা এই অবাধ মেলামেশা ও অবাধ কথাবার্তাই ব্যভিচারের প্রথম ধাপ। **যিনা-ব্যভিচার ইসলামী শরীয়াতের আলোকে কবীরাহ গুনাহ**, এর পরিণতিতে হাদীসে আখিরাতের কঠিন শাস্তির বর্ণনা এসেছে। এর প্রসারে সমাজ জীবনের কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে অশান্তি ও সন্ত্রাস এবং কঠিন রোগব্যাধি। আল্লাহর রাসূলের হাদীস অনুযায়ী কোন সমাজে যখন ব্যভিচার প্রসার লাভ করে তখন সে সমাজ আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হয়ে ওঠে। আর নারী ও পুরুষের মাঝে ভালবাসা উদ্রেককারী অপরাপর যেসকল মাধ্যম, তা যিনা-ব্যভিচারের রাস্তাকেই প্রশস্ত করে। এ সকল কিছু রোধ করার জন্য ইসলামে নারীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নারী ও পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র পৃথক করা এবং দৃষ্টি অবনত রাখার বিধান রাখা হয়েছে। যে সমাজ নারীকে অশালীনতায় নামিয়ে আনে, সেই সমাজ অশান্তি ও সকল পাপকাজের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়, কেননা নারীর প্রতি আকর্ষণ পুরুষের চরিত্রে বিদ্যমান অন্যতম অদম্য এক স্বভাব, যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই সামাজিক সমৃদ্ধির মূলতত্ত্ব। আর এজন্যই ইসলামে সুনির্দিষ্ট বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে যে কোন প্রকার সৌন্দর্য বা ভালবাসার প্রদর্শনী ও চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনের ফলাফল দেখতে চাইলে পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকানোই যথেষ্ট, গোটা বিশ্বে শান্তি, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ঝান্ডাবাহী খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ছয় মিনিটে একজন নারী ধর্ষিত হয় । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত তথাকথিত সভ্য দেশে মানুষের ভিতরকার এই পশুকে কে বের করে আনল? অত্যন্ত নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেও সহজেই বুঝতে পারে যে, স্রষ্টার বেঁধে দেয়া শালীনতার সীমা যখনই শিথিল করা শুরু হয়, তখনই মানুষের ভিতরকার পশুটি পরিপুষ্ট হতে শুরু করে। পশ্চিমা বিশ্বের অশালীনতার চিত্রও কিন্তু একদিনে রচিত হয়নি। সেখানকার সমাজে নারীরা একদিনেই নগ্ন হয়ে রাস্তায় নামেনি, বরং ধাপে ধাপে তাদের পোশাকে সংক্ষিপ্ততা ও যৌনতা এসেছে, আজকে যেমনিভাবে দেহের অংশবিশেষ প্রদর্শনকারী ও সাজসজ্জা গ্রহণকারী বাঙালি নারী নিজেকে শালীন বলে দাবী করে, ঠিক একইভাবেই বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে দেহ উন্মুক্তকরণ শুরু হয়েছিল তথাকথিত "নির্দোষ" পথে।

নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলন নিয়ে ইসলামের বিধান আলোচনা করা এই নিবন্ধের আওতা বহির্ভূত, তবে এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা চিত্র ইতিমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে। এই বিধি-নিষেধের আলোকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নারীর যে অবাধ উপস্থিতি, সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষের সাথে মেলামেশা – তা পরিপূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী, তা কতিপয় মানুষের কাছে যতই লোভনীয় বা আকর্ষণীয়ই হোক না কেন। এই অনুষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের ধ্বংসের পূর্বাভাস দিচ্ছে। ৩ বছরের বালিকা ধর্ষণ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিদ্যাপীঠে ধর্ষণের সেঞ্চুরি উদযাপন, পিতার সম্মুখে কন্যা এবং স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর শ্লীলতাহানি – বাংলাদেশের সমাজে এধরনের বিকৃত ঘটনা সংঘটনের প্রকৃত কারণ ও উৎস কি? প্রকৃতপক্ষে এর জন্য সেইসব মা-বোনেরা দায়ী যারা প্রথমবারের মত নিজেদের অবগুণ্ঠনকে উন্মুক্ত করেও নিজেদেরকে শালীন ভাবতে শিখেছে এবং সমাজের সেইসমস্ত লোকেরা দায়ী, যারা একে প্রগতির প্রতীক হিসেবে বাহবা দিয়ে সমর্থন যুগিয়েছে।

ব্যভিচারের প্রতি আহবান জানানো শয়তানের ক্লাসিকাল ট্রিকগুলোর অপর একটি, যেটাকে কুরআনে "ফাহিশাহ" শব্দের আওতায় আলোচনা করা হয়েছে, শয়তানের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন:

"হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু আছে তা থেকে তোমরা আহার কর আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । সে তো তোমাদের নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজ [ব্যভিচার, মদ্যপান, হত্যা ইত্যাদি] করতে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন সব বিষয় বলতে যা তোমরা জান না।" [সূরা আল বাকারা :১৬৮-১৬৯]

এছাড়া যা কিছুই মানুষকে ব্যভিচারের দিকে প্রলুব্ধ ও উদ্যোগী করতে পারে, তার সবগুলোকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের দ্বারা:

"তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। অবশ্যই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পন্থা।" [সূরা বনী ইসরাঈল: ৩২]

ব্যভিচারকে উৎসাহিত করে এমন বিষয়, পরিবেশ, কথা ও কাজ এই আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

বিভিন্ন সাজে সজ্জিত পর্দাবিহীন নারীকে আকর্ষণীয়, প্রগতিশীল, আধুনিক ও অভিজাত বলে মনে হতে পারে, কেননা, শয়তান পাপকাজকে মানুষের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে তোলে। যেসব মুসলিম ব্যক্তির কাছে নারীর এই অবাধ সৌন্দর্য প্রদর্শনকে সুখকর বলে মনে হয়, তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য:

ক. ছোট শিশুরা অনেক সময় আগুন স্পর্শ করতে চায়, কারণ আগুনের রং তাদের কাছে আকর্ষণীয়। কিন্তু আগুনের মূল প্রকৃতি জানার পর কেউই আগুন ধরতে চাইবে না। তেমনি ব্যভিচারকে আকর্ষণীয় মনে হলেও পৃথিবীতে এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি এবং আখিরাতে এর জন্য যে কঠিন শাস্তি পেতে হবে, সেটা স্মরণ করলে বিষয়টিকে আকর্ষণীয় মনে হবে না।

খ. প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করে দেখি, একজন নারী যখন নিজের দেহকে উন্মুক্ত করে সজ্জিত হয়ে বহু পুরুষের সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের মনে যৌন-লালসার উদ্রেক করে, তখন সেই দৃশ্য দেখে এবং সেই নারীকে দেখে বহু-পুরুষের মনে যে কামভাবের উদ্রেক হয়, সেকথা চিন্তা করে এই নারীর বাবার কাছে তার কন্যার নগ্নতার দৃশ্যটি কি খুব উপভোগ্য হবে? এই নারীর সন্তানের কাছে তার মায়ের জনসম্মুখে উন্মুক্ততা কি উপভোগ্য? এই নারীর ভাইয়ের কাছে তার বোনের এই অবস্থা কি আনন্দদায়ক? এই নারীর স্বামীর নিকট তার

স্ত্রীর এই অবস্থা কি সুখকর? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে কিভাবে একজন ব্যক্তি পরনারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনকে পছন্দ করতে পারে? এই পরনারী তো কারও কন্যা কিংবা কারও মা, কিংবা কারও বোন অথবা কারও স্ত্রী? এই লোকগুলোর কি পিতৃসুলভ অনুভূতি নেই, তারা কি সন্তানসুলভ আবেগশূন্য, তাদের বোনের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ স্নেহশূন্য কিংবা স্ত্রীর প্রতি স্বামীসুলভ অনুভূতিহীন? নিশ্চয়ই নয়। বরং আপনি-আমি একজন পিতা, সন্তান, ভাই কিংবা স্বামী হিসেবে যে অনুভূতির অধিকারী, রাস্তার উন্মুক্ত নারীটির পরিবারও সেই একই অনুভূতির অধিকারী। তাহলে আমরা আমাদের কন্যা, মাতা, ভগ্নী কিংবা স্ত্রীদের জন্য যা চাই না, তা কিভাবে অন্যের কন্যা, মাতা, ভগ্নী কিংবা স্ত্রীদের জন্য কামনা করতে পারি? তবে কোন ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, সে নিজের কন্যা, মাতা, ভগ্নী বা স্ত্রীকেও পরপুরুষের যথেচ্ছ লালসার বস্তু হতে দেখে বিচলিত হয় না, তবে সে তো পশুতুল্য, নরাধম। বরং অধিকাংশেরই এধরনের সংবেদনশীলতা রয়েছে। তাই আমাদের উচি অন্তর থেকে এই ব্যভিচারের চর্চাকে ঘৃণা করা। এই ব্যভিচার বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা হতে পারে, যেমনটি নবীজী(সা.) বর্ণনা করেছেন:

"...চোখের যিনা হচ্ছে তাকানো, জিহ্বার যিনা হচ্ছে কথা বলা, অন্তর তা কামনা করে এবং পরিশেষে যৌনাঙ্গ একে বাস্তবায়ন করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে।" [বুখারী ও মুসলিম]

দৃষ্টি, স্পর্শ, শোনা ও কথার দ্বারা সংঘটিত যিনাই মূল ব্যভিচার সংঘটিত হওয়াকে বাস্তব রূপ দান করে, তাই জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য সে সকল স্থান থেকে শতহস্ত দূরে থাকা, যে সকল স্থানে দৃষ্টি, স্পর্শ, শোনা ও কথার ব্যভিচারের সুযোগকে উন্মুক্ত করা হয়।

সঙ্গীত ও বাদ্য: নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকে সংগীত ও বাদ্য। ইসলামে নারীকণ্ঠে সংগীত নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ – একথা পূর্বের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট। সাধারণভাবে যে কোন বাদ্যযন্ত্রকেও ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া, যেমন বিশেষ কিছু উপলক্ষে দফ নামক বাদ্যযন্ত্র বাজানোর অনুমতি হাদীসে এসেছে। তাই যে সকল স্থানে এসব হারাম সংগীত উপস্থাপিত হয়, সে সকল স্থানে যাওয়া, এগুলোতে অংশ নেয়া, এগুলোতে কোন ধরনের সহায়তা করা কিংবা তা দেখা বা শোনা সকল মুসলিমের জন্য হারাম। কিন্তু কোন মুসলিম যদি এতে উপস্থিত থাকার ফলে সেখানে সংঘটিত এইসকল পাপাচারকে বন্ধ করতে সমর্থ হয়, তবে তার জন্য সেটা অনুমোদনযোগ্য। তাছাড়া অনর্থক কথা ও গল্প-কাহিনী যা মানুষকে জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তা নিঃসন্দেহে মুসলিমের জন্য বর্জনীয়। অনর্থক কথা, বানোয়াট গল্প-কাহিনী এবং গান-বাজনা মানুষকে জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য শয়তানের পুরোনো কূটচালের একটি, আল্লাহ এ কথা কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন:

"এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে পার পর্যায়ক্রমে বোকা বানাও তোমার গলার স্বরের সাহায্যে, ... " [সূরা বনী ইসরাঈল :৬৪]

যে কোন আওয়াজ, যা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহবান জানায়, তার সবই এই আয়াতে বর্ণিত আওয়াজের অন্তর্ভুক্ত। [তফসীর ইবন কাসীর]

আল্লাহ আরও বলেন:

"এবং মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর পথ থেকে [মানুষকে] বিচ্যুত করার জন্য কোন জ্ঞান ছাড়াই অনর্থক কথাকে ক্রয় করে, এবং একে ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে, এদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।" [সূরা লোকমান :৬]

রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেছেন:

"আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক হবে যারা ব্যভিচার, রেশমী বস্ত্র, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল বলে জ্ঞান করবে।" [বুখারী]

এছাড়াও এ ধরনের অনর্থক ও পাপপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বহু সতর্কবাণী এসেছে কুরআনের অন্যান্য আয়াতে এবং আল্লাহর রাসূলের হাদীসে।

যে সকল মুসলিমদের মধ্যে ঈমান এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের উচি এসবকিছুকে সর্বাত্মকভাবে পরিত্যাগ করা।

আমাদের করণীয়

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নববর্ষ সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এজন্য যে, এতে নিম্নোলিখিত চারটি শ্রেণীর ইসলাম বিরোধী বিষয় রয়েছে:

১. শিরকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি, চিন্তাধারা ও সংগীত
২. নগ্নতা, অশ্লীলতা, ব্যভিচারপূর্ণ অনুষ্ঠান
৩. গান ও বাদ্যপূর্ণ অনুষ্ঠান
৪. সময় অপচয়কারী অনর্থক ও বাজে কথা এবং কাজ
এ অবস্থায় প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে, নিজে এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা এবং মুসলিম সমাজ থেকে এই প্রথা উচ্ছেদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো নিজ নিজ সাধ্য ও অবস্থান অনুযায়ী। এ প্রসঙ্গে আমাদের করণীয় সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনা দেয়া যেতে পারে:

- এ বিষয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠীর দায়িত্ব হবে আইন প্রয়োগের দ্বারা নববর্ষের যাবতীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

- যেসব ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী, তাদের কর্তব্য হবে অধীনস্থদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা। যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এই নির্দেশ জারি করতে পারেন যে, তার প্রতিষ্ঠানে নববর্ষকে উপলক্ষ করে কোন ধরনের অনুষ্ঠান পালিত হবে না, নববর্ষ উপলক্ষে কেউ বিশেষ পোশাক পরতে পারবে না কিংবা শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবে না।

- মসজিদের ইমামগণ এ বিষয়ে মুসল্লীদেরকে সচেতন করবেন ও বিরত থাকার উপদেশ দেবেন।

- পরিবারের প্রধান এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন যে তার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী কিংবা অধীনস্থ অন্য কেউ যেন নববর্ষের কোন অনুষ্ঠানে যোগ না দেয়। (এটুকু ইনশা'আল্লাহ্ চাইলে সবাই/অনেকেই করতে পারবেন)

- এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সহপাঠী, সহকর্মী ও পরিবারের মানুষকে উপদেশ দেবেন এবং নববর্ষ পালনের সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দান করুন, এবং কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হোক নবী(সা.)-এঁর ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর।

"এবং তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার পরিধি আসমান ও জমীনব্যাপী, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য।" [সূরা আলে-ইমরান:১৩৩]